॥ ओ३म् ॥

বেদ কেন এবং কী?

ऋग्वेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद,
ऋग्वेद, यजुर्वे
अथर्ववेद
ऋग्वेद, यजु
वेद, अथर्ववेद

অধ্যাপক রাজেন্দ্র 'জিজ্ঞাসু'

॥ ओ३म् ॥

বেদ - কেন এবং কি?

লেখক

অধ্যাপক রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসু (পাঞ্জাব)

প্রকাশক

বেদাচার্য্য ডঃ বেদপ্রিয় শাস্ত্রী

গ্রাম - হাজীচক্

পোঃ- কেশপুর

জেলা - পঃ মেদিনীপুর

মোঃ- ০৯২০৪৪২৮৯৮০

পৌষ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

ডিসেম্বর ২০১২ খ্রীষ্টাব্দ

পুস্তক প্রাপ্তি স্থান

আর্য্য সমাজ সাহসপুর

বাঁকুড়া

মূল্য ঃ ১০ টাকা

মুদ্রণেঃ

মহাপ্রভু প্রিন্টার্স

কালনা, বর্ধমান

ওম্

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর রাজেন্দ্র 'জিজ্ঞাসু'

শতাধিক পুস্তকের পণেতা প্রফেসর রাজেন্দ্র 'জিজ্ঞাসু'র জন্ম সন্ ১৯৩২-এ গ্রাম-মালোমহে, জেলা-সিয়ালকোট (পশ্চিম পাঞ্জব)-এ হয়েছে। এঁনার বাবা শ্রীজীবনমলজী গ্রামের মধ্যে প্রথম আর্য্য সমাজী ছিলেন। লেখন-কলার অংকুরণ সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই হয়েছিল। রক্তসাক্ষী পণ্ডিত সেখরামজীর জীবন এবং বলিদানে প্রেরণা পেয়ে ইনি কলম ধরেছিলেন। শ্রী পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়জী ইত্যাদি অনেক মহাপুরুষদের আশীর্বাদ এবং প্রোৎসাহনে সাহিত্য-সেবাতে যেভাবে অগ্রে গতি করেছেন তা থেকে ইনি পিছনে ঘুরে দেখেন নি।

এঁনার অনেক মৌলিক কৃতির অনুবাদ দেশের অন্যান্য ভাষাতেও হয়েছে। অনেক-অনেক বার ছেপেছে। এশিয়া মহাদ্বীপে সর্বাধিক মৌলিক জীবনী লেখার রেকর্ড এঁনার রয়েছে। সন্ ১৯৫৮-তে গুরুদ্বারা সিগারেট কেসের মিথ্যা অভিযোগে অমানুষিক যাতনার রেকর্ড এঁনার নামেই রয়েছে। গঙ্গা-জ্ঞান-সাগর বৃহৎ গ্রন্থমালাটিকে চার ভাগে প্রকাশিত করে ইনি সাহিত্য জগৎকে একটি অমূল্য অবদানে সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। মালোশিয়ার মতো কট্টরপন্থী ইসলামী দেশের একটি গ্রন্থেও এঁনার জীবন-পরিচয় ছেপেছে। পশ্চিমের জগতেও এঁনার সাহিত্যিক উপলব্ধিদ্দ খুব চর্চা রয়েছে।

A.B.I (আমেরিকা)-র মতো বিশ্বখ্যাত সংস্থা এঁনাকে তাঁদের CONSULTING EDITOR রূপ চয়ন করেছেন।

প্রাক্ - কথন

বিগত সওয়া একশত বছরে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের আবশ্যকতা, তার আবির্ভাব এবং বেদের মহত্ত্বের উপর দেশ-বিদেশে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। মহর্ষি দয়ানন্দের আগমনের পূর্বে পশ্চিম দেশীয় (খ্রীষ্টান) লেখকগণের দ্বারা বেদের নিন্দা করার জন্য লিখিত সাহিত্যের যেন বন্যা এসে গিয়েছিল। পশ্চিমের অন্ধানুকরণ এবং দাসতার হীন মনোবৃত্তির ইংরেজী পঠিত ভারতীয় বাবুরত্তি বেদের উপহাস করতে কম করেনি।

ভারতীয় নেতা এবং পন্ডিত এই পশ্চিমদেশীয় সাহিত্যের বন্যাকে অবরোধ করার সাহস করতে পারে নাই। রাজা রামমোহন রায়ের মতো মহাপুরুষ বেদ পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারেন নাই। তিনি উপনিষদকেই বেদ বলে ভেবে নিয়েছিলেন। মহর্ষি দয়ানন্দের জন্ম-জন্মান্তরের সুপ্ত সাধনা জেগে উঠল। তিনি কার্যক্ষেত্রে পদার্পন করলেন। তিনি বিশ্বের সব বেদ-বিরোধীদের শাস্ত্রার্থ-সংগ্রামে আবাহন করলেন। তিনি বেদোদ্ধারের জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করলেন। তিনি নিজের প্রিয় জীবন পর্যন্তও বেদের উপর সমার্পন করলেন।

মহর্ষি দয়ানন্দের অদ্বিতীয় শিষ্য পন্ডিত গুরুদত্তজী পশ্চিমদেশীয় বিচার সমূহের এই বিনাশকারী বন্যাকে অবরোধ করার জন্য একটি ঐতিহাসিক কার্য করলেন। এই কাজটিকে একটি বৌদ্ধিক চমৎকার-ই বলা উচিৎ যে মাত্র পৌনে ছাব্বিশ বছর বয়সে এই মনীষী (GENIUS) তাঁর অলৌকিক প্রতিভার দ্বারায় তখনকার পশ্চিমী লেখকদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর পরে আর্য বিদ্বানেরা বেদের মহিমা এবং মর্মের উপর বহুকিছু লিখেছেন।

আর্য সমাজের শাস্ত্রার্থ. মহারথীরা বিধর্মীদেরকে বেদ-মহিমা স্বীকার করানোর ব্যাপারে বিশেষ সফলতা প্রাপ্ত করেছেন। কবিরত্ন "প্রকাশ" জীর এই নিম্ন পঙক্তিগুলি আর্য শাস্ত্রার্থ মহারথীদের এই উপলব্ধির সংকেত করছে-

করতে যে হমেশা চীখ চীখ অপমান জো পাবন বেদোঁ কা।
সির উনকা বেদোঁ কে আগে ঝুকওয়া দিয়া ঋষি দয়ানন্দনে।।

অর্থাৎ যাঁরা চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে পবিত্রবেদের অপমান সব সময় করতো, তাঁদের মাথাকে বেদের আগে ঝুকিয়ে দিয়েছিলেন ঋষি দয়ানন্দ।। বেদোদ্ধার এবং বেদ-প্রচারের আন্দোলনে এইসব শাস্ত্রার্থ মহারথীদের যোগদান স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য।

বেদের উপর যে প্রহার করা হয়েছে সেইসব প্রত্যেক প্রহারের উত্তর দিতে যে সব সাহিত্যকার এবং বিদ্বানেরা নিরন্তর কলম উঠিয়েছেন এবং নিজের জীবনকে আহূত করে দিয়েছেন - তাঁদেরকে শত শত নমন। এই ধরনের পুন্যাত্মাদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখনীয় হোল স্বামী দর্শনানন্দজী, পন্ডিত শিবশংকরজী, স্বামী বেদানন্দজী, ডাঃ বালকৃষ্ণজী, পন্ডিত চমূপতিজী, পন্ডিত ব্রহ্মদত্তজী জিজ্ঞাসু, মাস্টার লক্ষ্মণ জী, মেহেতা জৈমিনিজী, পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ জী চীফ জজ, পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়, পন্ডিত ধর্মদেবজী, পন্ডিত বুদ্ধদেবজী বিদ্যালংকার, স্বামী সত্যপ্রকাশজী, পন্ডিত যুধিষ্ঠির জী মীমাংসক ইত্যাদির নাম।

সন ১৯৫২-র কাছাকাছি পন্ডিত ধর্মদেবজী লিখিত ট্র্যাক্ট GLORY OF THE VEDAS পড়ে আমি খুবই প্রভাবিত হই। শ্রী পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় কৃত THE VEDAS-HOLY SCRIPTURES OF ARYANS - বইটিও ছিল অত্যন্ত বিচার-উত্তেজক এবং পঠনীয়। উক্ত সাহিত্য পড়ার পর মন চাইতো যে আমিও বেদ মহিমার উপর কিছু লিখি।

পূজ্য উপাধ্যায়জীও একবার আমাকে এই ধরনের পুস্তক লেখার আদেশ দিয়েছিলেন। ওঁনার জীবনকালে তো আমি ঐ কার্যটি করতে পারিনি। বর্তমানে তাঁর মনোকামনা পূর্ণ করাতে আমি সন্তোষ লাভ করছি। ফারসী-তে বলা হয় - "দের আয়দ দুরুস্ত আয়দ" (অর্থাৎ দেরী হোক্ কিন্তু কাজটা যেন ভালো হয়)। বিলম্ব তো ৪০ বছর হয়ে গেল পরন্তু এই বিলম্বেও বড় লাভ হয়েছে।

আনন্দের কথা হোল যে শ্রী বেদভূষণজী নগরোটা বগবাঁ-র (হিমাচল প্রদেশ) প্রবল প্রেরণার ফলস্বরূপ একটি অনেক পুরানো উৎকট ইচ্ছা মূর্তরূপ নিচ্ছে। এই পুস্তিকার প্রসার এবং প্রকাশনের জন্য শ্রী মদনলাল আর্যকে ধন্যবাদ দেওয়া তো একটি লোকাচারই হবে। আমি আশা করছি যে সব রকমের পাঠক এই পুস্তিকা থেকে লাভ প্রাপ্ত করবেন। এই পুস্তিকা জন উপযোগী তো বটেই,

সাথে সাথে বিদ্বানদের জন্যও এতে পর্যাপ্ত নূতন সামগ্রী রয়েছে।

রক্তসাক্ষী পন্ডিত লেখরামের অমূল্য বিচারকে আর্য সমাজ 'না শোনার মত' করে দিয়েছে। সংস্থাগুলির ঝঞ্জাটে ফেঁসে যাওয়া এই সমাজ সাহিত্যিক ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে গেছে। আর্য সমাজে যে যে ঠোস এবং উত্তম সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শ্রেয় ব্যক্তিগণকেই প্রাপ্ত হচ্ছে। সংগঠনকে নয়। পন্ডিত গুরুদত্ত, মহাত্মা মুনশীরাম, পন্ডিত লেখরাম, স্বামী দর্শনানন্দ, স্বামী বেদনন্দজী বহু কিছু লিখেছেন তো তার কারন হোল তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়াস ছিল। কলা প্রেসের কারণে উপ্যাধ্যায়জীর হাজার হাজার পৃষ্ঠা ছাপানো হতে পেরেছে। নিজের সাহিত্যের প্রকাশনের ব্যবস্থার দুঃসাহস উঠিয়েই আমি নিজের সাহিত্যিক শতক করতে পেরেছি। অনেক কিছু করে নিয়েছি —

বহুত নিকলে মেরে অরমান লেকিন ফিরভী কম নিকলে।

অর্থাৎ অনেক কিছু বের করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কমই বের হয়েছে।

এখনও অনেক কিছু করার ইচ্ছা। অনেক স্বপ্ন দেখে রেখেছি। দেখুন, আগে আগে কি হয়। যে সব বন্ধুদের বা প্রেমী পাঠকদের বৈদিক সাহিত্যের প্রসারে আমাকে বর্তমান পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে সহযোগ প্রাপ্ত হচ্ছে, আমি হৃদয় দিয়ে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকট করছি। এই পুস্তিকার লেখন এবং মুদ্রণে পাঠক ন্যূনতা-তো অবশ্যই দৃষ্টিগোচর করবেন। গুণীজনদের পরামর্শে আমি পরের সংস্করণে সংশোধন করে দেব।

আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলব যে এই পুস্তিকার মধ্যে আমি এমন অনেক ধরনের নূতন তথ্য-সামগ্রী এবং প্রমাণ দিয়েছি যা গত ষাঠ বছরে অন্য অন্য কোনো পুস্তকে দেওয়া হয়নি। আমি পিসে যাওয়াকে পিসি না। মৌলানা শাহাবুদ্দিন লিখিত মালয়ালম পুস্তক "বেদ-দর্শনম্", শ্রী আনোয়ার শেখ কৃত Vediccivilisation, তাঁর সম্পূর্ণ উর্দু সাহিত্য তথা শ্রী স্টিফেন ন্যাপ (Stephen Knaap) কৃত The Secret Teaching of the Vedas - ইত্যাদির উপর আমাদের নজর পড়েছে। পুস্তকের আকার ঐ সব সাহিত্যের প্রমাণ দেওয়াতে আমার কাছে বাধক হয়ে গেছে।

বিনীত ঃ-

রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসু

কবিতা কুঞ্জ / বেদ সদন,

অবোহর, পাঞ্জাব - ১৫২১১৬

পন্ডিত লেখরাম বলিদান পর্ব

৬ই মার্চ, সন ২০০৫

।। ওম্ ।।

বেদ - কেন? এবং কি?

সংসারের সেইসব জাতি এবং সমুদায় যাঁরা সৃষ্টি-কর্তার সত্তাতে বিশ্বাস করে, তাঁদের সবাই এও মানে যে সৃষ্টিকর্তা প্রভু হলেন করুণাসাগর, দয়ালু এবং কৃপালু। সৃষ্টির রচনা কেমনভাবে হয়েছে? কেন হয়েছে? কবে হয়েছে? কার জন্য সৃষ্টি রচনকরা হয়েছে? এইসব প্রশ্নসমূহের উত্তর সবাই পৃথক পৃথক দিক না কেন এবং সৃষ্টি রচয়িতার স্বরূপ সম্বন্ধে সবাইয়ের মান্যতা একই ধরনের নাই বা হোক পরন্তু সমস্ত আস্তিক জগৎ এ বিষয়ে একমত যে যিনি জগতের রচনা করেছেন তিনি জীবের ভালোর জন্যই সব কিছু করেছেন, দিয়েছেন।

প্রভুকী দেন নি? ঃ-

যে কোন মতে আস্থা রাখা আস্তিকের সাথে আপনি কথা বলে দেখুন। সবাই একস্বরে বলবে যে পরমেশ্বর মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য সব কিছু দিয়েছেন। জল, বায়ু, গাছপালা, বনস্পতি, ফুল, ফল, অন্ন, ধন, ধাতু, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, পবন................। জীবসমূহের উপযোগ, প্রয়োগের জন্য সব কিছু দেওয়া হয়েছে। প্রভুর নিয়ম হোল বড় বিচিত্র। মনুষ্য সৃষ্টির নিয়ম তো হল এই যে আবশ্যকতা প্রথমে হয়, আবিস্কার পরে হয়। পরন্তু পরমাত্মার সৃষ্টি নিয়ম হোল এর বিপরীত। প্রভু প্রমে আবিষ্কার করেন পরে আবশ্যকতা উৎপন্ন হয়। চোখের পূর্বে সূর্য তৈরি করেছেন। পিপাসার পূর্বে জল তৈরি হয়েছিল। প্রাণীর উৎপত্তির পূর্বে ধরতী তৈরি হয়েছিল। ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণীদেরকে রোদন করতে হয়নি। অন্ন, বনস্পতি, ফল, ফুল আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। বায়ু প্রথম থেকেই ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া প্রাণী পরে জন্মেছে। সন্তানের জন্ম হওয়াতেই মায়ের স্তনে দুধ বইতে থাকে।

জ্ঞানচক্ষু কী দেন নি? ঃ-

এখন বিচারনীয় প্রশ্ন হোল যে প্রভু মনুষ্যকে বুদ্ধিও তো দিয়েছেন। মনুষ্যের মধ্যে জানার জিজ্ঞাসা (INSTINCT OF CURIOSITY) সর্বদাই রয়েছে। দয়ানিধি পরমেশ্বর তাহলে কি মনুষ্যকে বুদ্ধির জন্য জ্ঞান প্রদান করেন নি? মানুষ্যের জিজ্ঞাসাকে শান্ত করার জন্য-ও সৃষ্টি রচনার সময় অর্থাৎ আদি

সৃষ্টিতেই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের আবির্ভাব হওয়া উচিৎ। এই সত্যকে স্বীকার করা, না করা, হঠ এবং দুরাগ্রহের পরিচয় দেওয়া হোল অশোভনীয়। এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা হোল মানব বুদ্ধির তিরস্কারই।

অন্য আর একটি দিকেও আপনারা ভাবুন। পরমেশ্বর মনুষ্যকে এতকিছু দিয়েছেন যে প্রভু-দত্ত পদার্থগুলিকে আমরা গণনাও করতে পারবো না। অনেক কিছু দেওয়ার সাথে বুদ্ধিও দিয়েছেন। বুদ্ধিকে জ্ঞান চাই। অতএব আপনি ভাবুন যে এটা কোথাকার ন্যায় হবে যে পরমাত্মা জগতে অসংখ্যক পদার্থ দিয়ে তার উপযোগ, প্রয়োগের বিধিবিধান মানুষকে না দিবেন। আপনি দেখবেন যে যখন কোনো কোম্পানী এক নূতন মেশিন তৈরি করে বাজারে নিয়ে আসে তখন মেশিনের বিক্রির সময় গ্রাহককে প্রয়োগ বিধি পুস্তিকা (Instruction Book) ও সাথে সাথে দেওয়া হয়। একবার আমি একটি মেশিন নিয়েছিলাম। প্রয়োগ বিধি নেওয়া ভুলে গিয়েছিলাম। আমার কাছে অনেক বড় সংকট দেখা দিল। ফলতঃ আমার যা হানি হয়েছিল, এখানে যদি তার বর্ণনা করি তাহলে পাঠক আমার বুদ্ধির উপর হাসতে থাকবে।

রচনাকে স্বীকার না করা ঃ-

যাঁরা সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের আবির্ভাবকে স্বীকার করে না তাঁরাও দয়ালু, কৃপালু প্রভুর সর্বজ্ঞতাকে উপহাস করে বেড়ায়। বন্ধুগণ ! রচনাকে তো মানবো কিন্তু এই রচনা কার (প্রভুর কাব্যকে, জ্ঞানকে) কে মানবো না এও হোল ঘোর নাস্তিকতা। যখনই কোনো রেলগাড়ী চালানো হয় সাথে সাথেই সময় সারণী (Time Table) ও ছেপে যায়। গাড়ী চালানোর মাস-মাস পরে বা বছর বছর পরে রেলওয়ের টাইম টেবিলের ঘোষণার কোনো অর্থই হয় না।

সবাই মানে ঃ-

অনাদিকাল থেকে আমাদের ঋষি মুণি এবং সংসারের বিচারক, সুধারক এটি মেনে আসছেন যে পরমদেব পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে চার ঋষির হৃদয় গুহাতে (CAVE LIKE HEARTS OF THE SEERS) তাঁর নিত্য অনাদি জ্ঞান বেদের প্রকাশ করেছেন। বাইবেল এবং কুরান-ও নিস্তেজ স্বরে, নীরব স্বরে এই সত্যকে স্বীকার করছে। এর প্রমাণ আমি পরে দিচ্ছি।

সর্বোৎকৃষ্ট-ই বাঁচবে ঃ-

ডার্বিন জগতের সামনে তাঁর বিকাশ মতকে রেখেছেন। এই বিকাশবাদের মান্যতানুসারে সংসারে সর্বোৎকৃষ্ট-ই বাঁচবে, বাঁচতে পারে, বেঁচে আছে। (SURVIVAL OF THE FITTEST) আমি এখানে বিকাশ মত এবং বিকাশবাদীদের সর্বোৎকৃষ্টের বেঁচে থাকার মান্যতার উপর কিছু না বলে এটাই বলবো যে সমস্ত সংসারের আস্তিক এবং নাস্তিক লোক তাঁরা যাই কিছু মানুক না কেন - তাঁরা এই কথার উপর একমত যে বেদ হোল সংসারের পুস্তকালয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ। বেদের থেকে পুরানো পুস্তক আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। ইংরেজ রাজত্বের সময়ে ভারতে সরকার দ্বারা পোষিত, প্রচারিত পশ্চিমদেশীয় বিদ্বানেরা বৈদিক ধর্ম এবং দর্শনের অবমূল্যন করেছে, বেদমন্ত্রের অর্থকে অনর্থ করেছে, বৈদিক বিচারধারাকে ভীষণভাবে পরিহাস করেছে পরন্তু সরকারের এইসব বেতনভোগী স্কলারদিগকে মানতে হয়েছে, লিখতে হয়েছে যে বেদ-ই হচ্ছে সংসারের প্রাচীনতম গ্রন্থ।

এখন বিচারশীল সজ্জনদের কাছে এইটি বলতে চাই যে Survival of the fittest (সর্বোৎকৃষ্ট-ই বেঁচে থাকবে)-র বিকাশবাদী মান্যতাকে এখানে বেদের উপর লাগু করুন এবং পূর্বাগ্রহ মুক্ত হয়ে এটি ঘোষণা করার সাহস করুন যে সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ার কারনেই বেদ আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে। বেদের রক্ষক তপস্বী বিদ্বানেরা বেদের এক একটি মন্ত্র, এক এক অক্ষর এবং এক এক মাত্রাকে মুখস্থ করে বেদের রক্ষা করেছেন।

পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদজী উপাধ্যায় বলেছেন - এই দীর্ঘকালীন সৃষ্টির ইতিহাসে শতশত মতান্তর এবং ধর্মশাস্ত্র হয়েছে এবং শেষ হয়ে গেছে। করাল কালের থাপ্পড়েও বেদের বেঁচে থাকা এটি প্রমাণিত করছে যে প্রকৃতি বেদের রক্ষা করে। "যেমনভাবে শতশত তুফানের ফলে বড় বড় মনুষ্য নির্মিত দীপক নিভে যায়, সূর্যকে নেভাতে পারে না, সেইরকম হচ্ছে বেদ-ও"। সৃষ্টির ইতিহাস সামান্য কিছু শতাব্দীর নয় - কোটি কোটি বছরের। এতবড় দীর্ঘ সময়ে সংসারে কত উত্থান-পতন হয়েছে। সংসারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেদ আজও সুরক্ষিত। এই তথ্যটি বেদের উপযোগিতা এবং যোগ্যতাকে প্রমাণিত করছে।

একটি হাস্যাস্পদ কথন ঃ-

চার অক্ষর পড়া কিছু লোককে এইরকম বলতে শোনা গেছে যে আজ এত পুরানো বেদের কথা বলা হোল এইরকম, যেরকম বায়ুযানের যুগে গরুর গাড়ির কথা বলা। দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে মুসলমানদের এক কার্যক্রমে একজন মৌলানা এই কথা বড় শ্রুতিমধুর শব্দে বড় জোর দিয়ে বলেন তথা কোরানকে ঈশ্বরের নবীনতম এবং অন্তিম বিধান বলে ব্যক্ত করেন। এই কথা শুনতে তো অনেক বড় কথা মনে হয় পরন্তু এতে কোনো সারতত্ত্ব নেই। এটি হোল এক সস্তা মত (Cheap Opinion)। কেবল পুরাতন হওয়াতেই কোনো বস্তু বা পদার্থ অনুপযোগী বা বেকার হয় না। বিজ্ঞান বলছে যে সূর্য পৃথিবীর থেকেও পুরাতন। জলছাড়া কি কেউ বাঁচতে পারে? বিনা পবন সংসার ক্ষণভরও চলতে পারে না। এসব তো গরুর গাড়ীর যুগে থেকেও পুরানো।

বিজ্ঞানের নিয়ম কি ঘসে গেছে ? ঃ-

সৃষ্টির যে সমস্ত নিয়মকে বৈজ্ঞানিক Eternal এবং Universal অর্থাৎ নিত্য, অনাদি এবং সার্বভৌমিক মানেন বা বলেন তা আজ পর্যন্ত ঘসেনি। এই নিয়ম প্রথম থেকেই চলে আসছে। গরুর গাড়ীর যুগ থেকেও পুরানো পরন্তু এর কোনো Substitute (বিকল্প)-র স্থান নিতে পারে এমন কোনো নূতন নিয়ম তৈরি হতে পারেনি। না কখনও তৈরি হবে। এঁদের ছাড়া বিশ্ব চলতে পারে না। এইভাবে প্রাচীনতম অনাদি বেদজ্ঞানের দ্বারাই বিশ্ব কল্যাণ সম্ভব।

আজ সংসারে খ্রীষ্টান এবং মুসলমান মতকে স্বীকার করা মানুষের সংখ্যা কোটি কোটি। আমি পূর্বে সংকেত দিয়ে রেখেছি যে এইসব মতের গ্রন্থ-ও এই সত্যের সাক্ষী দেয় যে পরমাত্মা সৃষ্টির আদিতে মানবকে তাঁর জ্ঞান প্রদান করেছেন এবং কখনও সমস্ত বিশ্বে একটিই ধর্ম এবং একটিই ভাষা ছিল। সেই একটিই ধর্ম কোন্‌টি?

কখনও বেদ-ই সারা সংসারের ধর্ম ছিল ঃ-

যখন আর অন্য কোনে মতই ছিল না, তো যে ধর্মগ্রন্থ তখন ছিল, সেইটিই ছিল সমস্ত বিশ্বের ধর্ম। বেদ হোল প্রাচীনতম-এতেই স্বতঃসিদ্ধ যে সারা সংসার কখনও বেদানুযায়ী ছিল। বাইবেলে পাওয়া যায়-

IN THE BEGINNING WAS THE WORD (দ্রষ্টব্য New Testament, John-1, VERSE-1) অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে প্রভুর শব্দ ছিল। স্মরনে রাখুন যে ভারতে তো বেদের প্রমাণকে শব্দ প্রমান-ই বলা হয়েছে। বাইবেলের এই আয়তে WORD শব্দ তিনবার প্রযুক্ত হয়েছেএবং তিনবারই W অক্ষরকে Capital-এ লেখা হয়েছে। এ থেকে সিদ্ধ হয় যে, এটি হোল ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা। বাইবেল-ই সাক্ষী দেয় যে কখনও বিশ্বের একটিই ভাষা ছিল।

"And the whole earth was of one language and of one speech" (দ্রষ্টব্য OLD TESTAMENT, GENESIS-II, VERSE-1) অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বে একই ভাষা ছিল, একই বানীর সর্বত্র ব্যবহার ছিল।

কোরানকে যাঁরা মানেন তাঁরা সত্যিকারের কোরাণকে মানুন বা না মানুক তাতে কিছু আসে যায় না পরন্তু কোরাণও উচ্চস্বরে ডেকে ডেকে বলছে - প্রথমে তো (সব) লোকেদের একটিই মত ছিল (দ্রষ্টব্য-কোরানের ভাষ্য 'ফতহ-উল-হমীদ' মঞ্জিল-১, পৃষ্ঠা-৫৫), সৃষ্টির একটিই ধর্ম ছিল। এই প্রমাণ কোরাণের একটি প্রামাণিক ভাষ্য থেকে দেওয়া হোল।

মৌলানা সৈয়দ মন্‌সূর আহমেদ আগাজী "বৈদিক ধর্ম এবং ইসলাম" পুস্তকের ভূমিকাতে লিখেছেন - "বৈদিক ধর্মের আর্বিভাব তথা বেদের বিদ্যমানতা হোল প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের ঘটনা"। মাননীয় মৌলানাজী স্পষ্ট শব্দে বেদকে প্রাচীনতম জ্ঞান গ্রন্থ বলে স্বীকার করেছেন। এই পুস্তকের লেখক সৈয়দ অখলাক হুসেন তাঁর এই কৃতির প্রথম প্যারাতেই এটি লিখেছেন যে "বেদ" শব্দই এঁকে ঈশ্বরীয় বাণী সিদ্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত। তিনি বেদকে মানবীয় প্রয়াস বা কল্পনার পরিণাম না মেনে ঈশ্বরকৃতই স্বীকার করেছেন।

তাঁর নিজের কথার সমর্থনে তিনি অলবেরুনীর প্রমাণ দিয়েছেন - "বেদের অর্থ হচ্ছে যাঁর জ্ঞান নেই, যে বিষয়ের জ্ঞান নাই তাঁকে জানা। হিন্দুদের মান্যতা হোল যে, বেদ হচ্ছে প্রভু প্রদত্ত জ্ঞান যেটি ব্রহ্মের (পরমাত্মা) বাণী থেকে নিঃসৃত হয়েছে.............বেদে বিধি এবং নিষেধের জ্ঞান রয়েছে। হিন্দু বেদকে লিপিবদ্ধ করাটাকে উচিত বলে মনে করে না। এঁর কারণ হোল যে বেদ পাঠ স্বর এবং সঙ্গীতের সাথে করতে হয়। লেখনী সংগীতকে (লয়) ব্যক্ত করতে অক্ষম। এমনিতেই লিখতে গেলে কিছু কম-বেশী হয়েই যায়"।

আমি অল্‌বেরুনীর এই বক্তব্যের উপর কোনো টিপ্পনী করতে চাই না। এঁর সাথেই লেখক অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন মুসলিম বিদ্বান মির্জা জানে জান মজহর শহীদজীর একটি ফার্সী কৃতি দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন। তার অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ- "ভারতীয়দের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের দ্বারা এ জ্ঞাত হয় যে, মানব-উৎপত্তির আদিতে মানব জীবনের শোধনের জন্য এবং মানব-জীবনের ব্যবহার তথা কল্যাণের জন্য পরমদেব পরমেশ্বর তাঁর করুণার প্রকাশ করতে গিয়ে বেদ নামের গ্রন্থ প্রদান করেছেন। এঁদের সংখ্যা হোল চার। এঁতে বিধি এবং নিষেধের জ্ঞান বিদ্যামান"। উক্ত দুইজন মুসলিম্ বিদ্বানদের মধ্যে এই কথার উপর মতৈক্য যে বেদের জ্ঞান সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বরের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে।

কোরানের একজন অন্য ভাষ্যকার মৌলানা সনাউল্লাজী অমৃতসরী ও তাঁর কৃতি "তফসীরে সনাঈ"-তে বেদকে ঈশ্বরের বানী বলে স্বীকার করেছেন। কোরানের অন্য আর একজন ভাষ্যকার খাজা হসন নিজামী-ও একজন খ্যাত নামা মুসলিম বিদ্বান্ এবং লেখক হয়েছেন। তিনি তাঁর "কৃষ্ণ কথা" কৃতিতে বেদকে পরমাত্মার দান বলে ব্যক্ত করেছেন।

মুসলমান এখন কাদিয়ানী মির্জাইদেরকে কাফির ঘোষিত করে ইসলাম ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছে। এই মতের সংস্থাপক কখনও একটি খারাপ কবিতাতে এ লিখেছিল ঃ-

"নাস্তিক মত কে বেদ হ্যাঁয় হামী(Agree)"- এই মির্জা-ই মরার সময় তাঁর পোথী (Book-let)-তে লিখে দিল-আমরা পরমাত্মার ভয়ে বেদকে ঈশ্বরীয় বাণী স্বীকার করি।

মুম্বই-র একজন পারসী বিদ্বান্ তাঁর একটি শোধপূর্ণ কৃতি Philosophy of Zorastrianism and Comparative Study of Religious নামক পুস্তকে বেদের বিষয়ে লিখেছেন -The Veda is a book of knowledge and wisdom comprising the book of nature, the book of religion, the book of prayers, the book of morals and so on. The word veda means wit, wisdom, knowledge, and truly the veda is condensed wit, wisdom and knowledge". অর্থাৎ বেদ হচ্ছে জ্ঞানের পুস্তক যাঁর মধ্যে প্রকৃতি, ধর্ম, প্রার্থনা, সদাচার ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকসমূহ সম্মিলিত রয়েছে। বেদের অর্থ হোল জ্ঞান এবং বাস্তবে বেদ হোল সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের

তত্ত্ব। এই পুস্তকটি Times of India, মুম্বই থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার দ্বারা সম্পাদিত পুস্তক বৈদিক সুরভি গ্রন্থে শ্রী পন্ডিত ধর্মদেবজী বিদ্যা মার্তন্ড-র লেখাতে এই পুস্তকের উক্ত প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

ফর্দন দাদাচানজী নামক এই বিদ্বান্ লেখক তাঁর উক্ত পুস্তকের এই পৃষ্ঠাতেই (সংখ্যা-১০০) ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের অনুবাদ দিয়ে লিখেছেন, "Thus we see that Agni in the hymns means both fire as well as god". অর্থাৎ এইভাবে আমরা দেখছি যে এখানে অগ্নিশব্দের অর্থ ভৌতিক অগ্নি এবং পরমেশ্বর দুটিই। বিদ্বান্ লেখক আগে লিখেছেন - "The vedas teach nothing but monotheism of the purest kind" অর্থাৎ বেদ তো কেবল শুদ্ধ এমন একেশ্বরবাদের শিক্ষা দেয় যা হোল পবিত্রতম।

লাহোর থেকে ১৯৪৫-এ শেষ মোহম্মদ অশরফজীর পুস্তক God, soul and universe in science and Islam প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি লিখেছেন- "Originally the conception of god among the Hindus was right when they believed Him to be unit and omnipresent but when they started dividing Him into different shape according to different functions which they considered He performed. They strayed for from thier original conception. The result was that many who were heroes in their life time, were gradually turned into incarnation of god and idolatery increased. Many Hindus believe that all their sins are washed away by having a dip in the holy water of the ganges. Thus it is seen that the great philosophical religion which conceived unity of god in the beginning brought in corruption and degradation of high ideas, when his attributes as the creater, the preserver and the destroyer were divided and alloted to different decities possessing seperate entities in different forms".

উক্ত উদ্ধৃতির ভাব হোল যে শুরুতে হিন্দুদের ঈশ্বর বিষয়ক দৃষ্টিকোন ঠিক ছিল। তারা প্রভুকে সর্বব্যাপক মানতো, পরে তারা ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বা অবতারের মধ্যে বেঁটে দিল। পরিণামস্বরূপ যে কেউ ব্যক্তি তাঁর জীবনকালে শূরবীর হয়েছেন তাঁকেই অবতার মেনে নেওয়া হোল। গঙ্গাতে

ডুবে স্নান করলে পাপ ধোয়ার ধারনা হিন্দুদের মধ্যে জাগ্রত হোল। এইভাবে আমরা দেখছি যে এক প্রভুর সত্তাতে বিশ্বাস করা মহান দার্শনিক ধর্ম পতনোন্মুখ হয়ে গেল। এঁদের আস্থা, বিশ্বাস বিকৃত এবং দূষিত হতে চলল। ঈশ্বরের তিনটি মুখ্য গুন জগতের কর্তা, ধর্তা এবং সংহর্তা-কে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে এবং দেবতাতে বিভক্ত করে দেওয়া হোল।

লেখক যা কিছু লিখেছেন তা সত্য। বৈদিক ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে হিন্দু সমাজ জল, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা বিদ্যার অধিপতি রূপে আলাদা আলাদা ভগবানের কল্পনা করে নিল। মনে করা হোল যে এই জগৎ এক পরমাত্মার বশে নাই, এঁর রচয়িতা একজন নয়, অনেক ভগবান এই সংসারের সঞ্চালন করছেন। এঁর থেকে আর কি বড় হাস্যস্পদ কথা হতে পারে। বেদ তো স্পষ্টরূপে একজনকেই জগতের সঞ্চালক বলে মানে। 'পতিরেক আসীৎ' এটি বেদের ঘোষণা হয় যে এই বিশ্বের একজনই স্বামী। বেদে ফের বলা হয়েছে যে, "বিশ্বস্য মিষতোবশী" (ঋগ্বেদ ১০-১৯০-২) এই সমস্ত সংসার সেই একই পরমপিতার বশে চলেছে। পৃথক পৃথক ভগবান জগতের ভিন্ন-ভিন্ন কার্য করছে না।

ভারতীয় মত, পন্থ তো সবাই বৈদিক ধর্মকে কোনো না কোনো রূপে স্বীকার করেই। শ্রী গুরু নানক দেবজীর একটি বিখ্যাত রচনা হোল -

দীয়া বলে অন্ধেরা জাঈ।
বেদ পাঠ মতি পাপাঁ খাই।।

অর্থাৎ দীপক জ্বললে যেমন অন্ধকার দূর হয়ে যায় তেমনি বেদপাঠ করলে পাপ মতি নষ্ট হয়ে যায়। গুরুবাণীতে বেদ পাঠকে মুখ্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। শ্রী গুরু অর্জুন দেবজী লিখেছেন-

বেদ বখিয়ান করতে সাধুজন।
ভাগহীন সমঝত নহীঁ খল।।

অর্থাৎ পরোপকারী বিদ্বান্ সাধু মহাত্মা বেদোপদেশ দিচ্ছেন। ভাগ্যহীন মূর্খ তাঁর ব্যাখ্যানকে, কথনকে বুঝতেই পারছে না। শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংহজী যা বলেছেন তাই লিখেছেন - সেটাও শুনুন ঃ- পঢ়ে সামবেদং জজুর বেদ কথং।

রিগ বেদ পঠিয়ং ভাব হথং।
অথর্ব বেদ পঠিয়ং সুনে পাপ নঠিয়ং।

(বিচিত্র নাটক অধ্যায় চার)

এখানে অন্তিম পংক্তিতে শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংহজী শ্রী গুরু নানক দেবজীর কথাকেই পুনঃ ব্যক্ত করেছেন। উপরে শ্রী গুরু নানক দেবজীর শব্দ আমরা দিয়েছি। বেদ জ্ঞানের শ্রবণে এবং তাঁর আচরনে পাপলীন মলিন মতিও নির্মল হয়ে যায়। এই কথাটিই এখানে গুরু গোবিন্দ সিংহজী লিখেছেন যে অথর্ববেদের পাঠ করলে এবং শ্রবণ মনন করলে পাপ দূরে পালিয়ে যায়। গুরুজী তাঁর বচনে চারটি বেদের মহিমাকে অভিব্যক্ত করেছেন। চার বেদ হল সত্য, চারবেদ হোল প্রভু ওঁকারের বাণী - একথা গুরুবাণী বলে এবং শোনায়। গুরুগ্রন্থের এই ঘোষণার আদর করেই মানব পাপ-তাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। বেদের মহিমার উপর অনেক কিছু লেখা যেতে পারে পরন্তু আমি এখন পূর্ব দেশীয় বিদ্বান্‌দের প্রমাণ না দিয়ে কিছু পশ্চিমদেশীয় বিদ্বান্ লেখকদের বিচারকে তুলে ধরব।

না মিশ্রণ না অপসারণ ঃ-

বেদ অধ্যয়নে রুচি নেওয়া সজ্জনদের কাছে তথা সত্যকে জানার ইচ্ছা রাখা সব জ্ঞান-পিপাসু জিজ্ঞাসুদের কাছে আমি পুনঃ বলপূর্বক এটি বলতে চাই যে যেমনভাবে সৌরমন্ডলে প্রকাশপুঞ্জ সূর্যের প্রকাশে আজ পর্যন্ত কোনো প্রকার মিশ্রণ হতে পারে নি ঠিক সেইভাবে পরমেশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান-ভানু বেদের মধ্যেও একেবারেই কোনো প্রকারের মিশ্রণ সম্ভব হয়ে উঠতে পারেনি। ধূর্ত এবং স্বার্থী লোকেরা নিজেদের স্বার্থের জন্য এবং নিজের স্বামী রাজাদের দুর্বলতাকে ধর্মানুকুল ব্যক্ত করার জন্য অনেক ধর্মগ্রন্থে মিশ্রণ করে দিয়েছে। মিশ্রণ থেকে না রামায়ণ বেঁচে আছে, না মহাভারত টিকে আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে মনুস্মৃতিতেও প্রক্ষেপ করে এঁকে দূষিত করে দেওয়া হয়েছে পরন্তু বেদের মধ্যে না কিছু মিশ্রণ করতে পেরেছে এবং না কিছু অপসারিত করতে পেরেছে।

প্রফেসার ম্যাক্সমূলর-ও এই সত্যকে খোলা হৃদয়ে স্বীকার করে লিখেছেন - The texts of the vedas have been handed down to us with such accuracy that there is hardly a various reading in the proper sense of the word or even an uncertain accent in the words of the Rigveda." (Origin of Religion - Page 131) অর্থাৎ বেদ সংহিতাগুলি আমরা এত শুদ্ধরীতিতে প্রাপ্ত করেছি যে এতে কোথাও পাঠভেদ পাইনি। সম্পূর্ণ ঋগ্বেদে একটি অক্ষরেরও পার্থক্য পাওয়া যায় নি।

একজন পশ্চিমী বিদ্বান্ শ্রী W.D. Brown বড় সারগর্ভিত শব্দ দিয়ে "বেদ কি এবং বেদে কি আছে" -এর উপর আলোকপাত করে লিখেছেন- The vedic religion recognised but one god. It is a thoroughly scientific religion where religion and science meet hand in hand. Here theology is based upon science and philosophy". অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম কেবলমাত্র একেশ্বরবাদকে মানে। এ পূর্ণতয়া বৈজ্ঞানিক ধর্ম যাতে ধর্ম এবং বিজ্ঞান হাত মিলিয়ে সাথে সাথে চলে। বৈদিক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান এবং দর্শনের উপর আধারিত।

থিলী নামক দার্শনিক দর্শনের ইতিহাসে লিখেছেন- "প্রাচীন জাতি সমূহের মধ্যে কেউ-ই দেবমালার শ্রেণী থেকে আগে অগ্রসর হয়নি এবং সম্ভবতঃ ইউনানবাসীকে ছেড়ে অন্য কোনো জাতি বাস্তবিক দর্শন শাস্ত্রকে জন্ম দেয়নি"। পরন্তু এটি হোল এক ভ্রান্ত বিচার। দর্শন শাস্ত্রের বিষয়ে লিখতে গিয়ে অন্য একজন দার্শনিক এটি লিখেছেন যে পশ্চিমের দেশে দেবগাথাগুলি থেকে দর্শনের জন্ম হয়েছে। এতো ঠিকই পরন্তু ভারতে তো পৌরাণিক সাহিত্য (দেবগাথা সমূহ)-র জন্ম দার্শনিক সাহিত্যের চিতার উপর হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক দার্শনিক শ্রী পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় ঠিকই লিখেছেন - "ইউনানের দর্শন শাস্ত্রের জননী হোল সেখানকার দেব মালা। পরন্তু ভারতীয় দেবমালা দর্শনের চিতার উপর জন্ম নিয়েছে এবং যখন যখন ভারতীয় দর্শন পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে তখন তখন দেবমালার হ্রাস হতে গিয়েছে"।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিচারক থৌরী বেদ বিষয়ে নিজের উদ্‌গার, বিচার ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন - "What extracts from the vedas I have read, fell on me like the light of the higher and purer luminary which describes a loftier course through a purer stratum free from particulars simple, universal, the vedas contain a sensible account of god". অর্থাৎ বেদের বিচারধারা হোল শ্রেষ্ঠতম। বেদে প্রকাশ আছে, বিজ্ঞান আছে। বেদ হোল সার্বজনিক, সার্বকালিক এবং সার্বভৌমিক। বেদে ঈশ্বরের সমীচীন, তর্কসঙ্গত বর্ণনা আছে।

বেদের উপর বহুদেবতাবাদ এবং প্রকৃতি পূজার দোষারোপন লাগানো হচ্ছে। এই দুষ্প্রচার ইংরেজ শাসনকালে বড় যোজনাবদ্ধ পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

দেশ স্বতন্ত্র হওয়ার পরেও বিদেশী ইতিহাস লেখকদের এই মতের খুব প্রচার করা হয়েছে। এইসব দুষ্প্রচারের আধার তো পুরাণ-ই। এই তথ্য জানার চেষ্টাই করা হয়নি যে পুরাণ সমুহের রচনা তো বেদ, উপনিষদ এবং দর্শনের প্রচারের হ্রাসের অনেক পিছনে হয়েছে।

ম্যাকডোনাল ঢোল পিটে পিটে বলতে লাগলো যে, ঋগ্বেদের আঠ মন্ডল তো প্রথমের এবং শেষের দুই মন্ডলের রচনা পরে হয়েছে। এই ধরনের লোকদেরকে এটি জেনে নিরাশা হয়েছে যে, ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের ১৬৪ নম্বরের সূক্ত-র মন্ত্রসংখ্যা ৪৬-এ অত্যন্ত স্পষ্ট শব্দে একেশ্বরবাদের ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সারা সংসার বেদের এই সূক্তি - "একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি" - কে জানে, মানে এবং নমন করে। এই মন্ত্রেই ইন্দ্র, মিত্র ইত্যাদি নামকে পরমাত্মার নাম বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। বেদে একাধিক বার এসেছে যে সেই হোল রুদ্র, সেই মিত্র এবং সেই হোল বরুণ। শেষের দুই মন্ডলে একেশ্বরবাদের পিছনে বৌদ্ধিক বিকাশ সিদ্ধ করার জন্যই ম্যাকডোনাল আদি এই গল্প বলতে লেগেছিল পরন্তু ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডল-ই এই ধারনাকে ধ্বস্ত করে রেখে দিয়েছে।

অথর্ববেদ বলছে যে পরমাত্মা হলেন এক, এক এবং এক-ই। প্রভুর সংখ্যা দুই নয়, তিন নয়, চার নয়, পাঁচ নয়, ছয় নয়, সাত নয়, আট নয় এবং নয় নয়। প্রভু হলেন অমিশ্রিত।

এই আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে কোরাণ এবং বাইবেলে ঈশ্বরের গুণ বাচক যত কিছু নাম রয়েছে, তা কোনো নূতন নয়। কোরাণে ঈশ্বরের মোট ৯৯টি নাম রয়েছে যথা- দয়ালু, কৃপালু, ন্যায়কারী, স্রষ্টা, পালক ইত্যাদি। এই সব নাম প্রথমেই আর্য জাতিদের জ্ঞাত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে প্রভুকে ন্যায়কারী, সুকৃত, দয়ালু, পিতা, মাতা, স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক, সর্বাধার বলা হয়েছে। অতঃ বেদের উপর বহুদেবতাবাদের দোষ তো কেবল সাম্রাজ্যবাদী হিতের রক্ষার জন্য লাগানো হয়েছিল। এটি ছিল ভারতীয়দেরকে ধর্মচ্যুত করার একটি কুচাল। ম্যাক্সমূলারের মতো সরকারী বেতনভোগী স্কোলারকেও এ স্বীকার করতে হয়েছিল ঃ- There are hymns which assert the unity of the Divine as fearlessly as any passage of the Old Testament or the koran. Thus the poet says - that which is one sage name it in various ways-they call it Agni, Yama, Matarishva

etc." [India what can it teach us]

ম্যাক্সমূলারকে উপরোক্ত শব্দে বেদের একেশ্বরবাদের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করতে হয়েছিল। একেশ্বরবাদ বেদের-ই অবদান। এ কোরান বা বাইবেলের কোনো নবীন অন্বেষণ বা অবদান নয়। একেই বলে জাদু যা মাথার উপর চড়ে সব কিছু ব্যক্ত করে। বেদে এক থেকে অধিকবার পরমাত্মার জন্য 'এক' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

বেদের উপর প্রশ্ন ঃ-

বেদের অধ্যয়ন না করেই কিছু লোক ভাবনা-চিন্তা বিনাই একদম বলে থাকে যে বর্তমান যুগ হোল বিজ্ঞানের যুগ। কম্পিউটারের যুগ এসে গেছে। অতি প্রাচীন, যাকে অনাদি বলা হয়, সেই বেদকে আজকের যুগের পক্ষে কি করে কল্যাণকারী মেনে নেওয়া যেতে পারে? এই পরিবর্তনশীল সংসারে থাকা, খাওয়া, চাল-চলন, লোক ব্যবহার সব কিছুর নিয়ম বদলে গেছে-তা সত্ত্বেও বেদ জ্ঞানের আজ কি মহত্ত্ব রয়ে গেছে?

এসব কথা শুনলে তো অত্যন্ত প্রভাবশালী মনে হয় পরন্তু এ হচ্ছে সস্তা মত (CHEAP OPINION)। এই ধরনের শংকা করা লোকেদেরকে একটুখানি জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে সংসারে কাতর নিয়ম বদলেছে? কার বিধান বদলেছে? কার জ্ঞান বদলেছে? মানবীয় নিয়ম তো পরিবর্তিত হতেই থাকে। মানবীয় শাসকদের নিয়ম, বিধান বদলায়। মানবের জ্ঞান বদলায়। মানবের রচনা বদলায় এক কলাকৃতি বদলায়। মানবের কারীগরীতে সংশোধন এবং পরিবর্তন হয়। সংসদভবনে রাজনিয়মগুলিতে সংশোধন হতে থাকে। আবিষ্কারেও (INVENTIONS) সংশোধন সম্ভব। সাইকেল, গাড়ী, উড়োজাহাজ, জলজাহাজ, ঘর, ঘড়ীর আকৃতি তো পরিবর্তিত হতেই থাকবে। কারন হোল - এ সব মনুষ্যনির্মিত। অল্পজ্ঞ জীবের কৃতি দোষযুক্ত হতে পারে। অতঃ ভাষণশৈলী, লেখন-শৈলী, কবিতা শৈলী এবং কার্যশৈলীতে সংশোধন সম্ভব। কারন হোল-জীবের অল্পজ্ঞতা।

সমস্ত যোনির সব মোডেল (Model) পুরাতন ঃ-

সৃষ্টি-নিয়ম আজ পর্যন্ত একটিও বদলায় নি, না বদলাতে পারে, এবং না বদলাবে। কারণ এ সব নিয়ম সর্বজ্ঞ প্রভুর তৈরি করা। পরমাত্মার কোনো

কৃতিই, কোনো মোডেল আজ পর্যন্ত বদলায় নি। মনুষ্য, পশু-পক্ষী, গাছপালা সব যেমনটি পূর্বকালে রচনা করা হয়েছিল, তৈরি করা হয়েছিল, আজও তেমনিই তৈরি হয়ে আসছে। কোনোও যোনির লেশমাত্র পরিবর্তন হয়নি। কানে শোনা, নাকে সুঁঘা, মুখ দিয়ে খাওয়া, পায়ে চলা, মুখে বলা, সব কিছু পূর্বের মতই।

সূর্যের কাট নাই, বিদ্যুতের কাট হয় (লোডশেডিং) ঃ-

সূর্য, চন্দ্র এবং জল, বায়ু তথা অগ্নি সবার নিয়ম আজই সেইরকম, যেরকম সৃষ্টির আদিতে ছিল। আমাদের মোটরগাড়ী ওয়ার্কশপে যেতেই থাকে পরন্তু পরমাত্মার সূর্য, চাঁদকে কখনও ওয়ার্কশপে পাঠানো হয় না। আমাদের বিদ্যুৎতো ফেল হয় এবং কাটও লাগে পরন্তু পরমাত্মার সূর্য এবং চন্দ্রের প্রকাশে কখনও কাট লেগেছে বলে দেখা যায় না। বিজ্ঞানের নিয়ম Discover খোঁজা তো হয় পরন্তু তৈরি করা যায় না। এ নিয়ম প্রথমেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে। সেইজন্যই তো একস্বরে একে সব বৈজ্ঞানিক (বর্তমানের এবং পূর্বের) নিত্য এবং সার্বভৌমিক (Eternal, Universal) বলে মানে।

আপনারা এমন একটাও উদাহরণ দিতে পারবেন না যাতে করে এ জানা যাবে যে অমুক বৈজ্ঞানিক নিয়ম দোষযুক্ত ছিল, অতঃ বদলে গেছে বা তাতে সংশোধন হয়েছে। পরমাত্মা হলেন পূর্ণ (Perfect)। তাঁর পূর্ণতার এইটাই প্রমাণ যে তাঁর রচনা হোল নির্দোষ। প্রত্যেকটি কৃতি নিজে নিজেই দোষরহিত। জগতে দোষ বা অপূর্ণতা জীবের কৃতিতেই দেখা যাবে। ভূগোল শাস্ত্রের, খগোল শাস্ত্রের, রসায়ন শাস্ত্রের, গণিতের বা পদাথবিদ্যার সব নিয়ম যেমনভাবে প্রথমে সত্য ছিল তেমনি আজও সত্য।

ঈশ্বরীয় নিয়ম ঘষে যায় নি ঃ-

ভৌতিক জগতের সব ঈশ্বরীয় নিয়ম পূর্ববতৎ সত্য, নির্দোষ এবং কল্যাণকারী যবে থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছে এইসব নিয়ম তখন থেকেই কাজ করে যাবে তাহলে মানব কল্যানের, আত্মোন্নতির, বিশ্বশান্তির, লোক এবং পরলোকের সংশোধনের, পরিবার এবং সমাজের উন্নতির ঈশ্বরীয় নিয়ম যা বেদের রূপে সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা দিয়েছেন তা কি করে বদলাতে পারে? ঈশ্বরীয় নিয়ম কখনও ঘসে না বা জর্জর হয় না।

কোন নূতন নিয়ম সৃজন করেছে? ঃ-

বিশ্বকল্যানের একটিও নিয়ম নূতন নয়। সংসারে উন্নতি অনেক হয়েছে। আমরা এও মানি, পরন্তু মনে রাখবেন ঈশ্বরীয় নিয়মকে ভাঙলে অবনতি ও স্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে। গাছ, পর্বত, নদী, এলোপাথাড়ি কেটে কেটে মনুষ্য ঈশ্বরীয় নিয়মগুলিকে ভেঙে দেখে নিয়েছে। প্রাণীদের সংহার করে বায়ুমন্ডলকে চিৎকারে ভরে দিয়েছে। সারা সংসার শোকাকুল। উন্নতি কী হয়েছে? এখন পুনঃ মনুষ্যকে গাছপালার, পর্বত, নদীর তথার মূক প্রাণীদের রক্ষার চিন্তা বিব্রত করে তুলেছে। অনেক উন্নতি করা সত্ত্বেও সংসারের বড় বড় বিচারক, নেতা, বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিজীবী বিশ্বকল্যানের জন্য, পরিবার, সমাজ এবং ব্যক্তির জন্য একটিও এমন কোনো নূতন নিয়ম তৈরি করতে পারেনি, বলতে পারে নি যার বর্ণনা বেদে না আছে। পুরাণ, বাইবেল এবং কোরাণের দোহাই দেওয়া ব্যক্তিও জগতের জন্য হিতকারী কোনো নবীন শিক্ষা দিতে পারেনি। বিশ্বকল্যানের জন্য যে যে শিক্ষা আজ সংসারকে দেওয়া হচ্ছে-তাতে কোনো নূতন কিছু নাই। পুরুষার্থ, পরমার্থ, ধীরতা, বীরতা, সহনশীলতা, প্রেম, সংযম, দান-দয়া, উদারতা, সত্যভাষণ, প্রাতঃ জাগরণ, আত্ম-সংযম, উপকার, সদব্যবহার, শুদ্ধবায়ু, সেবন, অন্ন-জলের শুদ্ধি, বাঁচো এবং বাঁচতে দাও - এঁর মধ্যে নবীন কী এবং কোনটা প্রাচীন নয়? ঘৃণা এবং দ্বেষ থেকে বাঁচার উপদেশ আজও ততটাই সার্থক যতটা প্রথমে ছিল। কৃপণতা এবং শোষণ প্রথমেও ঘৃণিত কর্ম ছিল এবং আজও নিন্দনীয়। পরোপকার পূর্বেও প্রশংসনীয় ছিল এবং আজও এর মহত্ত্ব রয়েছে। মনুষ্যের প্রবৃতি পরিবর্তিত হয় নাই-সেইরকম যেমন পূর্বে ছিল। এই কারনে মানুষের সংশোধনের, উপকারের নিয়মও তাই থাকবে যা সৃষ্টির আরম্ভে বিধাতা তৈরি করেছেন, বলেছেন। এই নিয়ম হোল অটল - অটলই থাকবে। কোনও ঈশ্বরীয় নিয়ম আজ পর্যন্ত নিরস্ত হয় নি।

সত্যের অন্বেষণ করা বা সত্যকে প্রেম করা বিচারশীল পাঠকদিগকে একটি নিবেদন করে আগে অগ্রসর হব যে যখন ইংরেজী ভাষার কবি ওয়ার্ডস -ওয়ার্থ, শেলী অথবা অন্য কেউ সাগরের, উষার, ফুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করে তখন ঐ সব কবিকে প্রাকৃতির (Nature) কবি বলে তার অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়। পরন্তু যখন বেদের কোনো সূক্তে উষার, নদীসমূহের,

সিন্ধুর, মেঘের, বর্ষার, বনের, বায়ুর, চন্দ্রের, সূর্যের বর্ণনা আসে তখন বৈদিক আর্যদের উপর ঈশ্বরেতর পূজার দোষ লাগানো হয়। দ্বিতীয় প্রকার মানদন্ড কেবলমাত্র অশোভনীয়-ই নয়, নিন্দনীয়ও বটে।

বেদ বিষয়ক একটি বিচিত্র বিচার ঃ-

একবার বেরেলী (উ-প্র)-তে মুসলমান ভাইদের উৎসব ছিল। শাস্ত্রার্থের জন্য শ্রী পন্ডিত রামচন্দ্রজী দেহেলবী সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। মুসলমান তৌরেত, জবূর, ইঞ্জিল আদিকেও আকাশীয় পুস্তক (ঈশ্বরীয় জ্ঞান) মানে পরন্তু বর্তমানে ঐসবকে নিরস্ত বলে মেনে নেওয়া হয়। পন্ডিতজী প্রতিপক্ষী মৌলানাকে স্বামী দর্শনানন্দেজীর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। পন্ডিতজী বললেন - "আল্লাহ তৌরতে কি ভূলে গিয়েছিলেন যে ইঞ্জিলকে আকাশ থেকে নামানো হল এবং ফের কোরানের পালা এসে গেল। এখন প্রশ্ন হোল এঁর পরে কি হবে? কি আসবে? যদি কোরানের কোনো ছেড়ে গেছে তাহলে"?

মৌলানা উত্তর দেওয়ার জন্য মুচকি হেঁসে উঠে বললেন - "মনে হচ্ছে যে পন্ডিতজীর কোনো হাকিম-বৈদ্যের সাথে পালা কখনও পড়েনি। হাকিম লোক পেটরোগীদেরকে প্রথমে আমাশয় (পাকস্থলী)-কে নরম করার জন্য কোনো ঔষধ দেন। যখন পাকস্থলী নরম হয়ে যায় তখন পেট থেকে মল বের করার জন্য কোনো জুলাব (বিরেচক) দেওয়া হয়। ঠিক সেইরকম আল্লাহ্ পূর্বকালের মনুষ্যদের মধ্যে সত্যের বা একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধ যত মল ছিল তাকে নরম করার জন্য কোরানের পূর্বে এইসব পুস্তক নামিয়েছেন এবং শেষে কোরান মজীদ নামিয়ে সমস্ত মলকে পূর্ণরূপে বের করে দিয়েছে ন"। শুনলে মনে হবে যে মৌলানার উত্তর ছিল বেজোড় (পূর্ণ)।

শ্রী পন্ডিত রামচন্দ্র দেহেলবী এই উত্তরে মৌলানা মহোদয়কে বললেন - "মৌলানা! আল্লাহ্‌র চিকিৎসাও হোল বড় বিচিত্র। যে সব লোকেদেরকে তৌরত, জবূর এবং ইঞ্জিল প্রদান করে পাকস্থলীকে নরম করা হয়েছে তাঁদেরকে কোরাণরূপী বিরেচক (জুলাব) দেওয়া হয়নি এবং আজ যাঁদেরকে এই বিরেচক দেওয়া হচ্ছে তাঁদের পাকস্থলীকে নরম করা হচ্ছে না। পেটের গন্ডগোল একজনকেই, অন্যের পাকস্থলীকে নরম করা হোল এবং বিরেচক তৃতীয় ব্যক্তিকে দেওয়া হোল"।

ইসলাম জীবকে অনাদি বলে স্বীকার করে না। পুর্ণজন্মকেও কাঠমুল্লারা ইসলামী শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলে থাকেন। অপবাদরূপে কিছু মুসলিম বিদ্বান্ জীব (SOUL) এবং প্রকৃতি কে (NATURE) অনাদি বলে মনে করেন। পুনর্জন্মের সিদ্ধান্তকেও মানেন পরন্তু প্রচলিত ইসলামের অনুসারে যাঁদের জন্য তৌরেত অবতরিত করা হয়েছিল, সেইসব জীব জবুর-র সময়ে ছিল না। ইঞ্জিল প্রাপ্ত করা জীব-ও নুতন সৃষ্টি করা হোল এবং কোরাণ যাঁদের জন্য অবতরিত করা হোল তাঁদের উৎপত্তি-ও নতুন। পূর্বে এ-ও ছিল না।

ইসলাম ঈশ্বরের গুণ, কর্ম এবং স্বভাবকে নিত্য বলে স্বীকার করে। জানি না নিত্য ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানের অবমূল্যন করার জন্য এমন এমন যুক্তি দেওয়াতে কি লাভ হয় বা হবে। এর ফলে ঈশ্বরের মহিমা কম হয় এবং কোরানের-ও মহিমা মন্ডল হয় না। সৃষ্টির আদিতে-ই জ্ঞানের আর্বিভাব মেনে নিলে সব সমস্যার সমাধান হয়।

বেদে কি আছে? ঃ-

কিছু লোক জিজ্ঞাসা করে যে বেদে কি আছে? ঋষি উত্তর দিচ্ছেন যে বেদ হল সমস্ত ধর্মের মূল। মানব কল্যাণের জন্য প্রভু বেদের মধ্যে বীজরূপে সারা জ্ঞান চার ঋষির হৃদয় গুহাতে প্রকাশিত করে দিয়েছেন।

সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধির একমেব মার্গ ঃ-

সমস্ত প্রাণী সুখ চায়। কেউ-ই দুঃখ চায় না। মনুষ্য তো সুখ সমৃদ্ধিকে চায়-ই। সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তির একটিই মার্গ। অন্য কোনো দ্বিতীয় বিকল্প নাই। এই মার্গ ঋগ্বেদের অন্তিম সূক্তে পরমাত্মা মানবকে দেখিয়েছে। এই সূক্ত "সংগঠন সূক্ত" নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তের সাথে দেশ, কাল বা কোনো বর্গ বিশেষের সাথে কোনো সম্বন্ধ নাই। আজ সারা সংসারে যুদ্ধের ভয় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রে মনুষ্যের জন্য মানব হিতে "সমানো মন্ত্রাঃ" - মিলে মিশে বিচার করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য "সমিতি সমানী"-র আদেশ-ও দেওয়া হয়েছে। মিলেমিশে বিচার তখনই হবে যখন সব জাতি এবং দেশের একটিই সমিতি হবে। সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধির যে উপায় এই মন্ত্রে বলা হয়েছে - এঁকে কে মিথ্যা করতে পারবে? আজ মিলেমিশে, মুখোমুখি বসে বিচার করার উপরে-ই প্রত্যেক সমস্যার সমাধান খোঁজার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

তারপর "সংগচ্ছধং" - মিলেমিশে চলার, মিলেমিশে বলার, সংবাদ করার উপদেশ রয়েছে। এই Walk together এবং Talk together-ই হচ্ছে আদর্শ সংসারের স্বরূপ। এই সমান মন্ত্র, সমান সমিতির স্বাভাবিক ফল। পরের একমন্ত্রে সমান হৃদয় এবং সমান মনের কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তদনুসার আচরণের সুখদায়ী পরিণাম হবে, মন এবং হৃদয়ের অনুকূলতা তথা একই রকমের ভাবনা।

এই সূক্তে আর একটি মার্মিক শব্দ এসেছে - "সুসহাসতি" - অর্থ হোল ভালোভাবে মিলেমিশে বসবাস করা। কখনও ভারত এবং চীন মিলে গিয়ে পঞ্চশীলের ঘোষণা করেছিল। তাতে একটি সিদ্ধান্ত ছিল সহ-অস্তিত্ব (Co-existence)। মিলেমিশে থাকা তো ভালো কথা পরন্তু এই শব্দে ভালোভাবে থাকার ভাবনা ব্যক্ত হয় না। সাথে সাথে থাকার জন্য পরস্পর সহযোগের আদেশ এই "সুসহাসতি" শব্দে দেওয়া হয়েছে। যেখানে পরস্পর সহযোগের ভাবনা হবে সেখানেই সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি হবে। ভালোভাবে জীবন ব্যতীত করার এইটিই একমাত্র মার্গ।

বৈদিক প্রার্থণা ঃ-

মানবের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যা কিছু চাই, তার জন্য বেদে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা রয়েছে। মনুষ্য সবকিছু পেয়ে-ও, সবকিছু নাশ করে ফেলে, হারিয়ে ফেলে কেবল বুদ্ধি না থাকার জন্য এবং কিছু না থাকার পরেও সবকিছু পেয়ে যায় কেবল নিজের উত্তম বুদ্ধির দ্বারা। বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র গায়ত্রী মহামন্ত্র দিয়ে গুরু বিদ্যা আরম্ভ করে আসছেন। এই মন্ত্রে পরমেশ্বরের কাছ থেকে উত্তম নির্মল বুদ্ধির কামনা করা হয়েছে। এমন বুদ্ধির যাচনা করা হয়েছে যা সৎকর্মের দিকে প্রেরনা দেবে। সংসারের কোনো মত, পন্থ বা গ্রন্থে এমন প্রার্থনা পাওয়া যাবে না। (শেখ আনোয়ার-র পুস্তক Vedic Civilisation-এ এই মন্ত্রের মহিমা পড়ুন। এই মন্ত্রে স্তুতি, প্রার্থণা এবং উপাসনা তিনটিই রয়েছে। এও একটি বিশেষতা)। এ কেবলমাত্র বেদের বিশেষতা-ই নয়, বিলক্ষণ তাও বটে। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে এ বলা হয়েছে যে- হে বুদ্ধি! তুই আমার কাছে সর্বপ্রথম অর্থাৎ আমার প্রথম প্রাথমিকতা।

বেদের ভাষা ঃ-

বেদের ভাষার অর্থ-গৌরব এবং সৌন্দর্য সংসারে সে নিজে নিজেই তাঁর উদাহরণ। এমনিতে তো সংসারের প্রত্যেক ভাষাতে একটি শব্দের জন্য অন্য অন্য পর্যায়বাচী শব্দ-ও প্রাপ্ত হয়। এবং এমন অনেক শব্দ রয়েছে যার অনেক অর্থ হয়। ফার্সী ভাষার মহান কবি শেখ সাদীর একটি পদ্য উল্লেখনীয় ঃ- সাদিয়া দরী দয়ার তূ মর্দে মুসাফরী।

বা কস সুখন ন গোঙ্গ কি গুজরাতিয়াঁ জনন্দ।।

প্রথম পংক্তির অর্থ হোল-ও সদী। তুই হচ্ছিস এখানকার যাত্রী। দ্বিতীয় পংক্তির দুইটি অর্থ- প্রথমতঃ তুই কারো সাথে কথা বলবি না-নাহলে গুজরাটী লোকেরা তোকে পিটবে। দ্বিতীয়তঃ- কাউকে বলবি না যে গুজরাটীরা হোল মেয়ে মানুষ। পরন্তু বেদের এক একটি শব্দ হোল যৌগিক। বেদে এক একটি শব্দের অনেক অনেক অর্থ বা সমানার্থক শব্দ হওয়ার কারনে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ-গৌরব, সৌন্দর্য তথা গাম্ভীর্য অদ্‌ভুত। এঁর থেকে বেদ মন্ত্রের গূঢ় ভাবকে দেখে ব্যক্তি আশ্চর্যচকিত হয়ে যায়। ঋগ্বেদে এসেছে ঃ-

সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।

অর্থাৎ পরমাত্মা যেমনভাবে এই সৃষ্টিতে সূর্যচন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে পূর্ব-সৃষ্টিতেও এইরকম সূর্যচন্দ্রকে তৈরি করে এসেছেন। এখানে যথাপূর্ব (Cyclic order) শব্দে সৃষ্টি রচনার সিদ্ধান্তকে তো রাখাই হয়েছে - ঈশ্বরের নিয়মসমূহের অটলতার সিদ্ধান্তকেও প্রস্তুত করা হয়েছে। অন্যান্য মত পন্থে ঈশ্বরের নিয়মের পরিবর্তন, চমৎকার হওয়া ইত্যাদি নিজের মত বা গ্রন্থের মহিমার প্রমাণ মেনে আসছে। ঋগ্বেদেই অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যে বিধাতা সৃষ্টিকে নিয়মের মধ্যে সাজিয়েছেন। এটি হোল বেদের অদভুত অবদান। বন্ধুগন! একটুখানি বিচার করুন - যদি জগৎ নিয়মবদ্ধ না হোত তাহলে বিজ্ঞান (Science) কোথায় টিকতো? "Perhaps lawlessness would have gone more aginst the theistic conception than the existence of law"-অর্থাৎ নিয়মবদ্ধতার জায়গায় অনিয়মিততা আস্তিকতার অধিক বিপরীত হয়।

জগতে সর্বত্র ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রত্যেক বস্তু তথা পদার্থের এবং ক্রিয়ার কিছু প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবস্থা দিয়ে নিয়মের মহত্ত্বকে জানা যায়। বেদে

বারম্বার অটল তথা সত্য নিয়মের গুণগান দৃষ্টিগোচর হয়। এ হোল বেদের মহান অবদান।

উক্ত মন্ত্রে ''যথাপূর্বম্''-র সাথে ঈশ্বরের জন্য 'ধাতা' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এই শব্দে গাগরের (কলশী) মধ্যে সাগরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এঁর জন্য কোনো-ই ভাষাতে কোনো শব্দ নেই। ধাতার অর্থ বিধাতা, Creator রচয়িতা-তো বটেই, এর অন্য আর একটি অর্থ হোল ধারণ করা শক্তি। ঈশ্বর জগতের রচনা, পালন তথা সংহার করেন। সে ধারন করার কারনেই তো তিনটি কার্য করতে পারেন। প্রভু যদি সর্বব্যাপক না হন তাহলে না তো সৃষ্টি রচনা করতে পারেন, না পালন করতে পারেন, না সংসারকে চালাতে পারেন এবং না সংহার করতে পারেন। সৃষ্টিতে প্রতিক্ষণ কিছু তৈরি হচ্ছে এবং কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে।

ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপক। তিনি হলেন ধাতা, তাইতো সহজ রীতিতে এইরকম হচ্ছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ তথা সর্বশক্তিমান-ও এই কারনে। ধাতা হওয়ার ফলেই তিনি হলেন সর্বাধার। পাঠকবৃন্দ! দেখলেন তো! বেদের একটি শব্দেই কতখানি গূঢ় অথচ সহজরীতিতে বোঝার দার্শনিকভাব পরমাত্মা ভাবনা ভরে দিয়েছেন।

এখানে প্রসঙ্গবশে এও চর্চা করে দিই যে ইংরেজদের শাসনকালের ইতিহাসে তথা অন্য গ্রন্থে-ও বেদকে 'গড়রিদের গীত' (ভেড়া চরানো লোকেদের গীত) বলার একটা ফ্যাশান চলেছিল। বেদের অবমূল্যয়নের জন্য তথা হিন্দুদেরকে বেদের থেকে ঘৃণা করানোর জন্যই এই সব শব্দের সৃজন হয়েছিল। এটা ঠিক যে প্রাণীজগতের প্রতি, বনস্পতির প্রতি, সূর্য, চন্দ্র, ঊষার এবং সাগরের তরঙ্গ পর্যন্তের প্রতি ভালোবাসা রাখা আর্যগন সব বেদ মন্ত্রের গান গাইতো। আমাদের পশুপালক ও বেদ ঋচার গান গাইতো। পশুপালক যদি বেদ ঋচার গান গায় তাহলে কি এতে বেদ ঋচার গৌরব হ্রাস হবে?

পশুপ্রেমী মহাপুরুষ ঃ-

হজরত মোহম্মদ বিড়ালকেও ভালোবাসতেন। তাঁকে উটওয়ালা বলা হোত। হজরত ঈসাকে কি ভেড়াওয়ালা বলা হোত না? সে কি পশুদেরকে ভালোবাসতেন না? আমাদের যোগেশ্বর কৃষ্ণ আদি সব মহাপুরুষ গোপাল ছিলেন। শ্রী গুরু নানক দেবজী মহিষ চরাতেন। কোরান এবং বাইবেলের

আয়তকে কি এইজন্য হীনদৃষ্টিতে দেখা যাবে? এই কারনে গীতা বা গুরুবাণীর মহিমা কি কম হতে পারে? বেদকে (Primitive) আদিম লোকেদের কাব্য বলে অভিহিত করার কি অর্থ? বেদ হোল প্রত্যেক যুগের জন্য, তেমনই যেমনটি সৃষ্টির অন্য নিয়ম বা বিজ্ঞান প্রত্যেক যুগের জন্য। এই প্রসঙ্গে অন্য আর একটি বিষয়ের উপর বিচার করা আবশ্যক।

যে সব মুসলমান ভাই পূর্বের আসমানী পুস্তক (তৌরত, ইঞ্জিল) কে বাতিল হওয়া স্বীকার করে এবং এরকম বলে যে অল্লাহ এবারে কোরনের সুরক্ষার গ্যারান্টি দিয়েছেন এবং দায়িত্বও নিয়েছেন। এখন কোরানে কিছু কম হবে না, কিছু বাড়বে না, কিছু পরিবর্তন হবে না। প্রলয় পর্যন্ত এই নিয়মই (কোরান) চলতে থাকবে। এই প্রকার চিন্তা-ভাবনা রাখা সজ্জনদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করছি যে সময়ের সাথে সাথে অল্লাহ-ই বদলে গেছে বা তাঁর গুণ, কর্ম, স্বভাব বদলে গেছে? যখন সে পূর্ব গ্রন্থকেই বাতিল করে দিয়েছে এবং তাঁর রক্ষা করতে পারেনি তাহলে বর্তমানে কি গ্যারেন্টি যে কোরাণ-কেও একদিন বাতিল করে দেবে না?

রোগী সংসার এবং বেদ ঃ-

আজ সংসারের বিকাশশীল দেশও ক্যান্সার, সুগার, হৃদয় রোগ এবং রক্তচাপ ইত্যাদি রোগের কারনে আতঙ্কিত। অথর্ববেদের বহ্মচর্য সূক্তের ২৬টি মন্ত্রে দশবার 'তপ' শব্দ এসেছে। এই সূক্তেই শ্রম, তপ, মেখলা এবং সমিধা-এগুলি বিদ্যার্থীর চার অলংকার বলে বলা হয়েছে। আজ বৈজ্ঞানিক এক স্বরে বলছেন যে শ্রমবিহীন এবং তপরহিত থাকা-খাওয়াটাই হোল ঘাতক রোগের মুখ্য কারন। যে অথর্ববেদকে পশ্চিমদেশীয় লেখকেরা জাদু-টোনার গ্রন্থ বলে তিরস্কার করেছে, সেই বেদেই তপ এবং শ্রমের এই মহিমার কথা বলা হয়েছে। তপস্বী এবং শ্রমশীল-ই বেঁচে থাকার অধিকার রাখে। অথর্ব শব্দের অর্থ হোল অকম্প (Unshakable)। আদিম মনুষ্য (Primitive) কি কোনো গ্রন্থের এইরকম মার্মিক নামকরন করতে পারে? কদাপি নয়। এতো সর্বজ্ঞ প্রভুর দান।

বেদের প্রার্থণা এবং পুরুষার্থ দর্শন ঃ-

সংসারে আস্তিকলোক ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রার্থনা করে চলে আসছে। প্রার্থনার দ্বারা সব লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু না কিছু চায়। লোকেরা প্রার্থনার

অর্থ-প্রভুর কাছ থেকে কিছু মেগে নেওয়া বা চাওয়া এই অর্থ ভেবে রেখেছে। বেদানুসার প্রার্থনা হোল প্রতিজ্ঞার সমানার্থবাচক শব্দ। অর্থাৎ প্রার্থনার পূর্বে পুরুষার্থ করা আবশ্যক। হাজার হাজার বছর পরে ঋষি দয়ানন্দ এমন একজন বিচারক এবং ধর্মাচার্য এলেন যিনি 'পূজা' শব্দকে 'পুরুষার্থের' সাথে মিলন করালেন। অন্যথা অন্ধবিশ্বাসী লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু চাওয়াকেই প্রার্থনার নাম দিয়ে রেখেছিল। পরমাত্মার কাছ থেকে কি চাওয়া উচিৎ, কি না চাওয়া উচিৎ-তা ভক্তকে জানা উচিৎ।

অথর্ববেদের একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র "স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা"-তে অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এঁর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাছ থেকে ১) পুরুষার্থ, গতি, উর্জা, ২) আয়ু, ৩) প্রাণ, ৪) প্রজা (সন্তান), ৫) পশু, ৬) কীর্তি, ৭) ধনসম্পদ, ৮) ব্রহ্মবাস (Spiritual Vigour) এবং মোক্ষ-র এই কামনা এই মন্ত্রে করা হয়েছে।

আপনারা বিচার করে দেখুন। এর পরেও মানুষকে আর কি চাই? পাওয়ার জন্য আর কিছুই বাকী নাই।

যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্রে-ও ঈশ্বরের কাছ থেকে উর্জা-র প্রার্থনা করা হয়েছে। কর্মন্যতার উপর বল দেওয়া হচ্ছে বেদের মৌলিকতা এবং বিশেষতা। সংসারের লোক রামভরসা অর্থাৎ কিছু না করাকে আস্তিকতা এবং ভক্তি বলে ব্যাখ্যা করে-লোক একনাগাড়ে বলতে থাকে-

"অজগর করেন চাকরি, পঞ্ছী করে না কাম"।

এটি সত্য নয় যে পাখী কাজ করে না। আপনারা চেতন সংসারের কথা তো ছেড়েই দিন। সম্পূর্ণ জড় জগৎ-ও গতি করে। তাই তো যজুর্বেদের ৪০ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে সংসারকে 'জগৎ' বলা হয়েছে। সব গ্রহ উপগ্রহ গতি করে চলেছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সব থেকে বড় প্রমাণ হোল যে তিনি গতি প্রদান করেন। প্রফেসার বিষ্ণু দয়ালজী ঠিকই লিখেছেন যে যদি 'জগৎ' শব্দ বাইবেলে আসতো তাহলে গ্যালিলিও-কে অসহ্য যন্ত্রনা ভুগতে হোত না। অকর্মন্যতার শিক্ষা দেওয়া ব্যক্তিকেও "হিম্মতে মর্দাঁ মদদে খুদা" (God helps those who help themselves) প্রভু তার সহায়তা করে যে নিজের সহায়তা নিজে স্বয়ং করে-একে জানতে হয়, মানতে হয়।

বেদে কৃষি, ব্যাপার এবং উদ্যোগ-শিল্প ঃ-

বেদে কৃষিকে প্রমুখ এবং পবিত্র ব্যাপার বলে বলা হয়েছে। কৃষক ঈশ্বরের সব থেকে বড় নিয়ম "কর্মফল" সিদ্ধান্তের উপর অটুট বিশ্বাস রাখে। যেমন বীজ বুনবে তেমনটি কাটবে। অতঃ যেমন করবে তেমন ভরবে এই অটল নিয়ম হোল ঈশ্বরীয় বিধানের জীবন। কৃষকের সম্পূর্ণ কার্য্য-ব্যবহার এই অটল নিয়মেরই তো ব্যাখ্যা। এই নিয়মের উল্লংঘন থেকেই ভ্রষ্টাচার, ঘুস, জমাখোরী (Hording) এবং কালোবাজারী এইরকম পাপকর্ম হয়ে থাকে।

বেদে 'মধু বাতা ঋতায়তে' আদি মন্ত্রগুলিতে জল, বায়ু, নদীগুলিকে কল্যাণকারী হওয়ার কামনা করা হয়েছে। বেদের শান্তি পাঠ পড়ুন। ধরতীকে স্বর্গধাম করার প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে। অন্তরিক্ষের অনুসন্ধান কর্তাদেরকে, বৈজ্ঞানিকদেরকে কোথাও আকাশে তো স্বর্গ (Heaven) দেখা দেয়নি। ধরতীর উপরেই স্বর্গ নামানোর প্রোগ্রাম এবং প্ল্যান (যোজনা) বৈদিক শান্তিপাঠে রয়েছে। মানব মনে, পৃথিবীতে, আকাশে, অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে, ঔষধিতে, বনস্পতিতে, সাগর-তরঙ্গে, পর্বত-জল-স্থল সবদিকে শান্তির নিবাস হোক। একাঙ্গী শান্তি দিয়ে শান্তি সম্ভব নয়। এইরকম পূর্ণ প্রার্থনা আর কোন গ্রন্থে আছে? এই একটি মন্ত্রের সাথেই তুলনা করে কেউ বলুন তো!

বেদে নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি দুইটিরই মহত্ত্বকে দেখানো হয়েছে। দুই-য়েরই সমন্বয় বলা হয়েছে। শরীর-নির্মান, জীবন-নির্মান, শিষ্য, গুরু, রাজা, প্রজা, গৃহস্থ, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, বিবেকশীল, শ্রমশীল, ডাক্তার, বৈদ্য সবার উন্নতি এবং কল্যানের বিধান পাওয়া যায়। কার কি কর্তব্য তা বেদে দেওয়া আছে।

বেদের জয় জয়কার ঃ-

সৃষ্টি-রচনা অভাব থেকে হয়নি। অনাদি জীবসমূহের জন্য অনাদি প্রকৃতি দিয়ে রচয়িতা এই জগতের রচনা করেছেন। Matter can neither be created nor it may be destroyed-প্রকৃতিতে না তো উৎপন্ন করা যেতে পারে, না এঁকে নষ্ট করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের এই ঘোষণা বৈদিক ধর্মের জয়কার, জয়ঘোষ। উপাদান কারন (Material cause)-র ছাড়া সৃষ্টির রচনার কথা সৃষ্টি-নিয়ম সহ্য করতে পারে না। পন্ডিত গঙ্গা প্রসাদ উপাধ্যায়জীর এই কথাটি হোল যথার্থ।

আমরা পুনরায় বলব যে বেদে কোথাও জাদু-টোনা, ভূত-প্রেত, বহুদেবতাবাদ, সুরাপান, মাংসাহার-র বিধান নাই। এসব কথা, এসব গল্প বেদের উপর আঘাত করার জন্য বেতনভোগী বেদভাষ্যকারেরা রচনা করেছে। ঐ সব ভাষ্যকার ভারতীয় অথবা অভারতীয় শাসকদের চাকর ছিল। শাসকবর্গকে প্রসন্ন করার জন্য, পাপী পেটের জন্য এঁরা বেদের অর্থকে অনর্থ করেছে। ঋষি দয়ানন্দ আজীবন কার-ও চাকরি করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু ধার্মিক নেতা যেমন স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ, রাজা রামমোহন রায় সরকারের চাকরি করতেন। সেই ঋষি ঈশ্বরের প্রেমপাত্র ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধার সাথে, পূর্ণ হৃদয়ের সাথে তাঁর নিজের প্রীতম প্রভুর অমর বেদবানীর ঠিক ঠিক অর্থ করে মানবমাত্রের অতীব উপকার করেছেন। তাঁর বেদভাষ্যের এইটিই বিলক্ষণতা এবং বিশেষতা এই যে তিনি ঈশ্বরের দিশা নির্দেশে বেদ ভাষ্য করেছেন। এই কার্যে তার (Guide) মার্গদর্শক ছিলেন সর্বজ্ঞ প্রভু। তাঁর আর অন্য কোনো (Boss) মালিক অথবা অন্নদাতা ছিল না।

বেদে কী নাই? ঃ-

এই পুস্তকের সমাপ্তি করতে গিয়ে আমরা 'বেদে কী নাই'-এই সম্বন্ধে খ্যাতনামা মুসলমান মৌলানা ডাক্তার গুলাম জৈলানির পুস্তক "এক ইসলাম-র" প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক এবং উপযোগী বলে মনে করছি।

"বেদে মূর্তিপূজার কোনো কোথাও উল্লেখ নাই। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কেবলমাত্র এক পরমাত্মার উপাসনার আদেশ দেওয়া আছে। কেননা পন্ডিত (পৌরাণিক, ব্রাহ্মণ)-র মানসিকতা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। এজন্য আদর এবং উপাসনার মধ্যে কোনো পার্থক্যই থেকে ছিল না। অতঃ সে পরমেশ্বর এবং মহাত্মা গান্ধী দুইয়ের সামনে নতমস্তক হয়ে ঝুঁকে যায়। সে কৃষ্ণের মূর্তি এবং সম্রাট আকবরের চরণে চুমা খায়। তাকে হিমালয়ের উপরে প্রভুর সিংহাসন দেখা দেয়"। (মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র সিংহাসন সপ্তম আকাশে দেখা যায়) সে বিদ্যুতের আওয়াজ এবং ঝড়ের আওয়াজে দেবতাদের ভয়াবহ আওয়াজকে শুনতে পায়।

সে সর্পের ফণাতে এবং ময়ূরের নৃত্যে ঈশ্বরকে মগ্ন হতে দেখা দেয়। এবং এইজন্য সে পবিত্র বেদের এক একটি অক্ষরে এক একটি নূতন ভগবানকে

খুঁজে বেড়ায়। বুঝতে পারি না যে কেবল এক পরমাত্মাতে ব্রাহ্মণের সন্তুষ্টি কেন হয় না? যখন সে জানে যে, এই সৃষ্টি, সাগর, পর্বত, কোটি কোটি সূর্য, চন্দ্র একই পরমাত্মার রচনা। সেই প্রভুর শক্তির অনুমান লাগানো কঠিন। তাঁর কাছে সমস্ত প্রকারের দানের অসংখ্য ভান্ডার রয়েছে। বায়ুকে সেই চালায়। বর্ষা সেই বর্ষণ করে। ভূমি থেকে অন্ন, ধন সেই সৃষ্টি করে।

এতে কোনোই সংশয় নেই যে- "বেদে ঈশ্বরের গুণবাচক নাম যথা ব্রহ্মা (মহান), মহাদেব (বড় দেব), বিষ্ণু (রক্ষক) ইত্যাদি এবং দেবতাদের (দেবদূত) বর্ণনা রয়েছে। পরন্তু অনেক ভগবানের কোথাও নিশান পর্যন্তও পাওয়া যায় না"- (দ্রষ্টব্য ঃ এক ইসলাম ঃ উর্দু পুস্তক লেখক ডাঃ গুলাম জৈলানী পৃষ্ট ১৭৪-১৭৫)।

এহচ্ছে ঋষি দয়ানন্দের কৃপার ফল যে ইসলামের এক প্রখ্যাত প্রবক্তা এবং বিদ্বান্ লেখক এই প্রকারে বেদের মধ্যে একেশ্বরবাদ এবং এক ঈশোপসনার সিদ্ধান্তকে খোলা হৃদয়ে স্বীকার করেছেন।

ইনিই ডাঃ গুলাম জেলানী তাঁর নিজের পুস্তকে আগে তিনটি মহত্ত্বপূর্ণ প্রমাণ দিয়েছেন। মার্শম্যান বলেছেন- "বেদের মুখ্য সিদ্ধান্ত হোল এক ঈশের উপাসনা। এঁতে ঈশ্বরেতর অন্য কোনো সত্তার পূজার উল্লেখ নাই। এঁতে সন্দেহ নাই যে, যত্র তত্র দেবসমূহের বর্ণনা প্রাপ্ত হয় পরন্তু এঁতে সংসারের গুপ্ত শক্তিসমূহই হোল অভিপ্রেত। দুঃখের কথা হোল যে, হিন্দু জাতি বেদের শিক্ষা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে"। (মার্শিয়ান হিস্ট্রী, পেজ-১)।

অন্য একজন লেখক কালব্রুক লিখেছেন ঃ "বেদে অনেক ভগবানের পূজার কোথাও বর্ণনা নাই। (এশিয়ার ঐতিহাসিক খোঁজ, পেজ-৩৮৫)।

প্রফেসার উইলসন মহোদয় বলেছেন- "বেদে প্রতিমা পূজন এবং প্রতিমা তৈরি করা সিদ্ধ হয় না। (অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত উইলসনের ভাষণ, পেজ-১৪)।

কিছু পশ্চিমদেশীয় খ্রীষ্টান লেখক ঋগ্বেদকে যীশুর দুই হাজার বছর আগে বলে আসছে, কেউ বেদের রচনাকাল তিন হাজার বছর পূর্বে এবং বেশকিছু যীশু থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে হয়েছে বলে রাগ গেয়ে যাচ্ছে। শ্রী পন্ডিত ভগবৎ দত্তজী বলতেন-আমাদেরকে উক্ত বক্তব্যে খারাপ ভাবা উচিৎ

নয়। এঁরা তো সৃষ্টির আয়ুকেই ছয় হাজার বর্ষ বলে স্বীকার করে। এ তো এঁদের বাহাদুরী যে বেদকে এঁরা যীশুর সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বের পুরাতন গ্রন্থ মেনে নিয়েছে। এঁরা সৃষ্টি তৈরি হয়েছে পাঁচ হাজার বর্ষ বলে মানে এবং আমরা পাঁচ হাজার বর্ষ থেকে বিকৃত বলে মানি। এঁদের চিন্তার (কি বেদ সাড়ে পাঁচ হাজার বর্ষ পুরানো) অভিপ্রায় তো ঠিকই যে বেদের আবির্ভাব সৃষ্টির আরম্ভেই হয়েছে। আনন্দের বিষয় যে এখন এসব লোকবেদে জাদু-টোনা, ভূত-প্রেতের পরিবর্তে যীশু, মোহম্মদ আদি নিজেদের মহাপুরুষদিগকে, দেবদূতগণকে দেখতে লেগেছে।

বিধান বিনা ন্যায়-ব্যবস্থা কি ভাবে? ঃ-

এটি তো সবার কাছে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সৃষ্টির নিয়ম হোল অটল। পরমাত্মার নিয়ম ঘসে না, মিটে না, বদলায় না, কম হয় না, বেশী হয় না। আর একটি কথা বিচারণীয় যে খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সবাই ঈশ্বরকে ন্যায়কারী মানে। সেই প্রভু সদা-ই পাপ এবং পুন্যের দুঃখ এবং সুখরূপে ফল দেন। সেই পরমাত্মা পূর্বেও ন্যায় প্রদান করতেন এবং আজও। কোনো নিয়মকে ভাঙলে এবং পরমাত্মার আজ্ঞার অবহেলনা করলেই তো দন্ড দেওয়া হয়। নিয়ম, ব্যবস্থা এবং আদেশ না বলে তো কাউকে পাপী বলে দন্ডিত করা যেতে পারে না। বাইবেল তথা কোরাণে পূর্বেও প্রভু ন্যায় দিতেন, দন্ড দিতেন। নিজের জ্ঞান, বিধান এবং ব্যবস্থা বিনা বলেই কি তিনি মনুষ্যদিগকে দন্ড দিয়ে চলেছেন? বিধি বিশেষজ্ঞ কেউ-ই, কোনো ব্যক্তিই এঁকে মানবে না। এথেকে এইটি সিদ্ধ হয় যে, পরমাত্মার বিধান বেদ সৃষ্টির আদিতেই আবির্ভূত হয়েছে। সৃষ্টির আদিতেই এই ব্যবস্থা লাগু করা হয়েছে। বিধান লাগু করার পরেই কাউকে দোষী নিরূপিত করা যেতে পারে-অন্যথা নয়।